

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ভাষাচর্চার ‘মূলধারা'য় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.3
Pages	২৫-৩৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ভাষাচর্চার 'মূলধারা'য় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা

মোহাম্মদ আজম*

সারসংক্ষেপ: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমকালীন ভাষাচর্চার প্রভাবশালী ধারা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানেই কাজ করেছেন। বিষয় ও রীতির দিক থেকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেন প্রমুখের সমান্তরালেই চলেছে তাঁর ভাষাবিজ্ঞান-সাধনা। কিন্তু তাঁর অনেকগুলো মত, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলা ভাষাচর্চার মূলধারার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠিত বা প্রভাবশালী মত এড়িয়ে ভিন্নমত জানিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর এ ধরনের তৎপরতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'অন্তর্ঘাতমূলক' তৎপরতা হিসেবে। দেখানো হয়েছে, অনেকগুলো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর অস্বস্তি ছিল। কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে সেগুলো রদ করার কৌশল বা প্রযুক্তি তাঁর হাতে ছিল না। ভিন্নমত বা সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তাঁর সে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটেছে। শহীদুল্লাহ্‌র এই তৎপরতা একদিকে প্রভাবশালী মতের বাইরে গিয়ে মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের উৎসাহিত করে; অন্যদিকে বাংলা ভাষাচর্চার প্রভাবশালী ধারা ও প্রবণতার পর্যালোচনামূলক বিচারে সহায়ক-ভূমিকা পালন করে।

১

ভাষা এবং ভাষার চর্চা এক বস্তু নয়। একটা ভাষা জনগোষ্ঠী যেভাবে ব্যবহার করে, তার মধ্যে 'স্বাভাবিক' যেসব রূপভিন্নতা দেখা যায়, স্থানিক-শ্রেণিগত-পেশাগত কারণে যেসব ব্যবহারিক ফারাক তৈরি হয়, সেগুলোকে একত্রে বলতে পারি ভাষার স্বাভাবিক রূপ। এসব রূপের ব্যবহারবিধি, প্রতিটির বা কোনো একটির স্বরূপ, তাদের স্বভাব এবং পারস্পরিকতা বিশ্লেষণ করাই ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। অন্য ভাষার সাথে তুলনামূলক আলোচনাও এ কাজের অংশ। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে ভাষাচর্চাকারীরা এ ধরনের 'কাণ্ডজ্ঞান' অর্জন করেছে খুব বেশি আগে নয় – বড়জোর বিশ শতকের গোড়ায়। এর আগে পর্যন্ত ভাষার চর্চা ছিল মূলত দুইটি মূলনীতিভিত্তিক : এক. আদর্শ বা বিশুদ্ধ ভাষার ধারণা প্রতিষ্ঠা; দুই. ধরে-নেওয়া আদর্শ ভাষার আদলে তৈরি করা আনুশাসনিক রীতি-পদ্ধতি ব্যবহারিক ভাষায় আরোপ করা।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ ধরনের চর্চা মোটা দাগে মান বা প্রমিত ভাষার ধারণার সাথে যুক্ত। মান বা প্রমিত ভাষার ধারণা মোটেই নিরীহ কোনো ব্যাপার নয়, বরং সরাসরি ক্ষমতা-সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। জনগোষ্ঠীর জয়ী অংশের ভাষাই যে মানভাষার শিরোপা জিতে নেয়, তাতে কোনো সন্দেহ নাই (Philipson 2003 : 39)। তবে হিসাবটা অত সরল নয়। একবার স্থিরীকৃত হলেই যে মানভাষা চিরকালীন বা দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব পেয়ে যায় তা নয়। চলে গ্রহণ-বর্জনের অব্যাহত প্রক্রিয়া। প্রভাবশালীদের মুখের ভাষাও – যে ভাষার ভিত্তিতে ভাষার মানরূপ স্থির হয় – বদলাতে থাকে। ওই বদলের সাথেও মানভাষা অনবরত খাপ খাইয়ে চলে। বিখ্যাত রুশ তাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিন একে ব্যাখ্যা করেছেন 'একটি বিশেষ মুহূর্তে ভাষার বহুবিচিত্র রূপ আর কেন্দ্রাতিগ শক্তির সাথে একরৈখিক রূপের (unitary language) অব্যাহত লড়াই' হিসাবে (Bakhtin 1994 : 270)।

এই একরৈখিক রূপটাই সাব্যস্ত হয় প্রমিত বা মানভাষা হিসাবে। 'ভাষাচর্চা'ও মোটের উপর ভাষার এই রূপ অবলম্বনেই হয়ে থাকে। কারণ, 'সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতা-সম্পর্কের চলনের সাথে ভাষার এই কেন্দ্রায়ণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত' (Bakhtin 1994 : 271)। এখানে ভাষাচর্চার একটা কেজো সংজ্ঞা দিয়ে নেয়া দরকার। দিনযাপনের নিত্য প্রয়োজনে মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। সাধারণভাবে এ ব্যবহার খুব সতর্কতার সাথে হয় না। কিন্তু ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহার, যেমন, বক্তৃতা বা অফিস-আদালতের ব্যবহারে, সতর্কতার পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ ভাষার 'শুদ্ধরূপ' ব্যবহারের ঝোঁক বাড়ে। যে কোনো ধরনের লেখালেখিতে এই সতর্কতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়। ভাষার আনুষ্ঠানিক ব্যবহার আর লেখার কাজে ব্যবহারকে তাই 'ভাষাচর্চা' বলা যেতে পারে। কিন্তু ভাষাচর্চার আরেকটি দিক আছে, যেখানে ভাষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়, ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন করে নানা মাত্রার আনুশাসনিক বিধি স্থির করার চেষ্টা চলে। এ লেখায় 'ভাষাচর্চা' বলতে মূলত এই শেষোক্ত ধরনের চর্চাকেই বোঝানো হয়েছে।

ইউরোপে নন্দনতত্ত্বের হাজার হাজার বছরের চর্চার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাখতিন লিখেছেন :

> অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব, অগাস্টিনের কাব্যতত্ত্ব, মধ্যযুগের গির্জার কাব্যতত্ত্ব – 'সত্যের একমাত্র ভাষা' যার অবলম্বন, কার্থেজীয় নব্য ধ্রুপদীবাদ, লাইবনিজের বিমূর্ত বিশ্বজনীন ব্যাকরণ কিংবা হামবোল্টের মূর্ততার প্রতি জোরারোপ – এদের মধ্যে সূক্ষ্ম যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, আদতে সামাজিক-ভাষিক এবং মতাদর্শিক জীবনের কেন্দ্রমুখী অভীপ্সাই তাতে প্রকাশ পেয়েছে। ইউরোপীয় ভাষাগুলোর কেন্দ্রমুখী একরৈখিক রূপ প্রণয়নের প্রকল্পেই সবাই সাহায্য করেছে। (Bakhtin 1994 : 271)

এ কথা ভাষাচর্চাকারীদের ক্ষেত্রেও সর্বাংশে প্রযোজ্য। প্রযোজ্য ইউরোপীয় ভাষাসহ যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই। 'আধুনিক' বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে কথাটার অতিরিক্ত মূল্য আছে। 'আধুনিক' যুগের শুরু থেকে অনেক দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে

নিশ্ছিদ্র ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাপনায় (মোহাম্মদ আজম ২০১৪)। ওই ঔপনিবেশিক যুক্তিতেই 'আদর্শ ভাষা' সংস্কৃতের সাথে মিলিয়ে বাংলা ভাষার 'আদর্শ রূপ' নির্ধারণের বাড়তি চাপ কাজ করেছে। যে কোনো প্রমিত রূপের জন্যই দরকার হয় 'প্রয়োজনীয়' কৃত্রিমতা। বলা যায়, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে গড়ে-নেয়া কৃত্রিম ভাষাকেই বারবার গড়াপেটা করতে হয়েছে গত প্রায় দুশ বছর ধরে।

২

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ (১৮৮৫-১৯৬৯) যে সময়টাতে ভাষাচর্চা করছিলেন, সে সময়ে বাংলা ভাষাচর্চার সাধারণ ভূগোলটা একবার দেখে নেয়া যাক। তাঁর ভাষাচর্চার কাল মূলত বিশ শতকের বিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত। উনিশ শতকে বাংলা ভাষাচর্চা হয়েছে প্রধানত 'প্রথাগত' ব্যাকরণ আর অভিধানের এলাকায়। এ সময় অসংখ্য ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। ব্যাকরণগুলোর লক্ষ্য ছিল মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ, বিশেষত *মুগ্ধবোধ*, অনুসারে বাংলা ব্যাকরণের গ্রহণযোগ্য রূপ প্রণয়ন করা (নির্মল ২০০০; হুমায়ুন ২০০২; মোহাম্মদ আজম ২০১৪)। প্রকাশিত অভিধানের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক অভিধান ছাড়াও বেরিয়েছিল অসংখ্য সংস্কৃত শব্দের অভিধান, যাতে করে নতুন আমদানিকৃত বা ইতিমধ্যে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের 'শুদ্ধ' ব্যবহারবিধি রপ্ত করে নেয়া যায়; আর বেরিয়েছিল অনেকগুলো আরবি-ফারসি শব্দের অভিধান, যাতে বাংলায় প্রচলিত এ ধরনের শব্দগুলো চিনে নিয়ে তা বাদ দেয়া যায় (সরস্বতী ২০০০; মোহাম্মদ আজম ২০১৪)।

বাংলা গদ্য-ব্যাকরণ-অভিধানের এই ধারার চর্চার প্রবল প্রতাপের মধ্যে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শুরু করেন এক নতুন ধারার ভাষাচর্চা (Ganguli1990)। অনতিপরে এ ধারায় আবির্ভূত হন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। এঁদের চর্চার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন অর্জন (হুমায়ুন ২০০২)। পরবর্তীকালে যাকে বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলা হয়েছে, এঁদের প্রত্যেকের চর্চায় তার সুস্পষ্ট লক্ষণ ছিল। ১৮৯৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হলে এ ধারার ভাষাচর্চা কার্যকর সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্মযজ্ঞ আর বেশ কিছু সভার কার্যবিবরণী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, অল্পসংখ্যক নতুন চর্চাকারীর স্বর সেসময়ে প্রভাবশালী স্বরকে চাপা দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল (রবীন্দ্রনাথ ১৪০২; হরপ্রসাদ ২০০০)। বিশ শতকের প্রথম দশকের পর এ স্বর নিস্তেজ হয়ে আসে।

বাংলা ভাষাচর্চার পরবর্তী ধারা মূলত তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ধারায় বিকাশলাভ করে। বীম্‌স্‌, হর্নলে, গ্রিয়ার্সন প্রমুখ এ ধারার সূচনা করেন উনিশ শতকের শেষাংশে (নির্মল ২০০০)। বিশ শতকের বিশের দশক থেকে এ ধারায় ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হন বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, সুকুমার সেন

প্রমুখ। লক্ষণীয়, এ ধারার ভাষাবিদরাই আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাচর্চার সবচেয়ে সফল ব্যক্তিত্ব। সে সময়ে এ ধারার সাফল্যের কয়েকটি কারণ এভাবে চিহ্নিত করা যায়: এক. পশ্চিমে তুলনামূলক আর ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানই ছিল ওই সময় পর্যন্ত সবচেয়ে সফল আর ব্যাপক প্রণালি-পদ্ধতি; দুই. দুনিয়াজুড়েই তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল সংস্কৃত ভাষা। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত-উৎসের শব্দ প্রচুর। বাংলা সংস্কৃতের কন্যা – এ ধরনের ধারণা উনিশ-বিশ শতকের অত্যন্ত প্রভাবশালী ধারণা। তদুপরি প্রাকৃত বাংলাকে সংস্কৃতের আদলে সহিশুদ্ধ করে নেয়ার নানামাত্রিক চেষ্টাও শত বছর ধরে চলেছিল। এই বাস্তবতা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির বেশ অনুকূল ছিল। তিন. বিশ শতকের প্রথম দুদশকে *চর্যাপদ* আর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষাচর্চা এক নতুন যুগে প্রবেশ করে। বাংলা ভাষার অতীত পুনরুদ্ধারের জন্য তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি বেশ যুতসই বিবেচিত হয়। বাংলা ভাষার প্রধান বিশ্লেষকদের সবাই ব্যতিক্রমহীনভাবে এই দুই গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেছিলেন।

শহীদুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হয়েছিল। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

৩

দেখা যাচ্ছে, সেকালে বাংলা ভাষাচর্চার মূলধারার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি দুটি। পদ্ধতির দিক থেকে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি, আর উপাদানের দিক থেকে সংস্কৃতের সাপেক্ষে বা সাহায্যে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ। এ অবস্থার প্রতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কোনো বিরাগ ছিল না। থাকার কোনো কারণও নাই। তিনি এ ধারারই মানুষ ছিলেন। শহীদুল্লাহ্ 'সংস্কৃত'ই হতে চেয়েছিলেন। হয়েছিলেনও। আর দশজন যেমন হতে চায় এবং কেউ কেউ হয়। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে সংস্কৃতে স্নাতক হয়েছিলেন। কুখ্যাত 'শহীদুল্লাহ্ অ্যাফেয়ার্সে'র (মুহম্মদ এনামুল ১৯৬৭ : ৭) পরেও পড়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই – তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে – যেখানে সংস্কৃতই ছিল তাঁর চর্চার প্রধান বিষয়। 'তাঁহারই প্রচেষ্টায় রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগ বাংলা ও সংস্কৃত-বিভাগে পরিণত হয়' (মুহম্মদ এনামুল ১৯৬৭ : ১৫)। রশীদ হায়দার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে মিলাদ-অনুষ্ঠানের পর তিনি এক শিক্ষার্থীকে দোয়া করেন 'সংস্কৃতে' (রশীদ ১৯৬৭ : ১১২)।

এ তো গেল ব্যক্তিগত পক্ষপাতের দিক। যে বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, সে বিষয়ের সঙ্গেও সমকালীন ওই ভাষাচর্চার কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি 'শব্দবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন' (সুকুমার ১৯৮৫ : ৬৪)। অনেকগুলো ভাষা জানতেন বলে তুলনামূলক আলোচনা তাঁর জন্য অনেক সহজ ছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৭: ১৮৬) লিখেছেন:

> সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন কথ্য আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত তার পরবর্তী স্তরের পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষায় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বিশেষ জ্ঞান থাকায় এ উপমহাদেশের আর্যভাষা গোষ্ঠীর যে-কোনো ভাষার ইতিহাসভিত্তিক ভাষা বিজ্ঞানের চর্চাও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যে কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে এ-উপমহাদেশে তাঁর জুড়ি মেলা ভার

তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা একই ইঙ্গিত দেয়। পড়েছেন কমপক্ষে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে: 'তিনি মূলত: 'কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের' বিশিষ্ট সৃষ্টি হইলেও, 'জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়ের' স্নেহের দুলাল ও 'প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের' বীরপুত্র' (মুহম্মদ এনামুল ১৯৬৭ : ৫)। সর্বত্রই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সেকালের অত্যন্ত প্রভাবশালী তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাশাস্ত্রে। তাঁর চর্চায়ও এর খুব বেশি ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু বাংলা ভাষা-সম্পর্কিত তাঁর বেশ কিছু মতামত আর সিদ্ধান্ত একজন ভিন্নমতাবলম্বী হিসাবে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কুলজি-ঠিকুজির তত্ত্ব-তালাশে তাঁর ভিন্নমত বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়। এখানে এরকম দুটি এলাকার উল্লেখ করা হল।

এক. বাংলা ভাষার উৎপত্তি-সম্পর্কিত মত :

দীর্ঘদিন ধরে রচিত ইংরেজি-বাংলা প্রবন্ধের সার-সংকলন করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রকাশ করেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*। এ বইতে তিনি খুব নিরীহ ভঙ্গিতে গুরুতর সব সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এর মধ্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি-সম্পর্কিত মত সবচেয়ে বিখ্যাত।

প্রথমে তিনি পূর্ববর্তী মতগুলোর পর্যালোচনা করেছেন। শুরু করেছেন 'বাঙ্গলা সংস্কৃতের দুহিতা' – এই মতের পর্যালোচনা দিয়ে (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯ : ২৭-২৮)। তাঁর মতে, সংস্কৃত হতে বাংলা জন্মেছে, এই মত কেউ পোষণ করতে পারে না। কারণ, বাংলার আগে অপভ্রংশ ও প্রাকৃত ছিল। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের একটি সাহিত্যিক ভাষা। তাই সংস্কৃত যুগ বলে ভারতীয় আর্যভাষার কোনো যুগ কল্পনা করা যায় না। কয়েকটি উদাহরণ পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, 'বাঙ্গালা সংস্কৃতের দুহিতা নহে, তবে দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া বটে'।

এরপর তিনি মাগধী প্রাকৃতের সাথে বাংলা সম্পর্ক পর্যালোচনা করেছেন (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯ : ২৮-৩০)। মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ হয়ে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে – এ মত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের দুটি যুক্তি খণ্ডন করেছেন শহীদুল্লাহ্। বাংলায় শ, ষ, স – এ তিনটির উচ্চারণ একই – শ। মাগধীতেও তাই। মাগধীতে আবার 'র' স্থানে 'ল' হয়। শহীদুল্লাহ্ বলছেন, বাংলা কিংবা এর সহোদরা ভাষা আসামি, উড়িয়া, বিহারিতে এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য নাই। আবার বাংলার 'শ'-

কারত্ব মাগধী থেকে ধারাবাহিকভাবে আসেনি। সংশ্লিষ্ট কথ্য অপভ্রংশে এ বৈশিষ্ট্য ছিল না। থাকলে বাংলার সহোদরা ভাষাগুলোতেও তা পাওয়া যেত। কিন্তু 'উড়িয়া এবং বিহারীতে স-কার এবং আসামীতে হ-কার দৃষ্ট হয়'। এমনকি বাংলার পশ্চিমাংশে এখনো স-কার প্রচলিত আছে। সুতরাং, তাঁর সিদ্ধান্ত, 'বাংলা ভাষার শ-কারত্ব অনেক পরবর্তী যুগের স্বতঃউৎপাদিত'।

যাঁরা বলেন মাগধী থেকে বাংলার উৎপত্তি হয়েছে, তাঁদের আরেকটি যুক্তি হল: মাগধী প্রাকৃতে কর্তায় 'এ'-কার হয়, বাংলায়ও কোনো কোনো স্থলে এরূপ দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্‌র ভাষ্য এই যে, কর্তৃকারকের 'এ'-কার মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়; আরো বহু প্রাকৃতে তা ছিল। ফলে বাংলায় এর উদ্ভব সাদৃশ্যবশত হতে পারে। মাগধী-মত অনুসারীদের আরো কিছু শব্দ পর্যালোচনা করে তিনি সাদৃশ্য বা ঋণ হিসাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: 'বাংলা তথা তাহার সহোদরা ভাষাগুলি মাগধী প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই'।

এরপর শহীদুল্লাহ্ তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেন (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৯ : ৩০-৩১)। তাঁর মতে বাংলা উদ্ভূত হয়েছে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত গৌড় অপভ্রংশ থেকে। বৈয়াকরণদের বর্ণিত কোনো ভাষার সাথে এই প্রাকৃত বা অপভ্রংশ মিলবে না। তুলনামূলক ব্যাকরণের সাহায্যে এই কল্পিত ভাষার লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তিনি। এই নাম তিনি দিয়েছেন 'সুবিধার অনুরোধে'। আর নাম দুটি নিয়েছেন যথাক্রমে দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ* আর মার্কণ্ডেয়র তালিকা থেকে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে হারিয়ে যাওয়া 'মূল ভাষা' পুনর্গঠনের সুযোগ আছে – এই সুবিধা নিয়ে শহীদুল্লাহ্ এভাবে আলাদা হয়ে গেলেন। আলাদা করে নিলেন বাংলাকে। স্মরণ করা যেতে পারে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর গ্রিয়ার্সনের মতের বাইরে গিয়ে শহীদুল্লাহ্ বাংলা-অহমিয়া-উড়িয়ার জন্য আলাদা গোত্রনাম প্রস্তাব করেছিলেন।

দুই. বাংলা ব্যাকরণচর্চা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* প্রকাশ করেন ১৯৩৫ সালে। ভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথসহ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত অন্য বৈয়াকরণদের স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'ইহাতে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই সাধু বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫ : ১৪৮)। সংস্কৃত উপাদানের ক্ষেত্রেও তিনি খানিকটা ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছেন। ইৎ-সহ প্রত্যয় নির্দেশের যে রেওয়াজ পূর্ববর্তী ব্যাকরণগুলোতে দেখা যায়, তিনি তা বাদ দিয়ে 'ইৎ-শেষে যে প্রত্যয় থাকে' কেবল তা-ই উল্লেখ করেছেন। ফলে তাঁর ব্যাকরণে খল্, খ, ঘঞ্, অল্, অচ্, অট্ ইত্যাদি সমস্ত প্রত্যয়ই 'অ' প্রত্যয় হিসাবে নির্দেশিত হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তও এর অনুকূল: 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাদানকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের সংজ্ঞা পরিত্যাগ করা উচিত' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫ : ১৪৮)। উল্লেখ্য,

বাংলা প্রত্যয়গুলোর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ তিনি নিয়েছেন প্রধানত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ থেকে। বস্তুত, 'বাংলা ব্যাকরণ যে একটি পৃথক ব্যাকরণ এই বোধের পরিচয় গ্রন্থটির প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়' (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১ : ২৯)।

তাঁর এ ব্যাকরণের প্রশংসা করেছেন অনেকে। যেমন মুহম্মদ আবদুল হাই লিখেছেন (১৯৬৭ : ১৮৭-৮৮) : 'বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বড় কাজ হচ্ছে তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। ... [এর] প্রতিটি বিভাগেই বাংলা ভাষার বর্ণনা ব্যাপারে তাঁর একটি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বিধৃত'। কিন্তু বলতেই হবে, এই ব্যাকরণে নতুন বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নের বিশেষ সাফল্য দেখা যায় না। তিনি 'সংস্কৃত ব্যাকরণকে এবং তাঁর পূর্ববর্তী প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদেরই অনুসরণ করেছেন' (হুমায়ুন ১৯৮৮ : ১২২)।

৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষা-বিষয়ক রচনাদি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের সবাই ব্যতিক্রমহীনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পাণ্ডিত্য আর সুনামের তুলনায় তাঁর কাজের পরিমাণ কম। তাঁর লেখা খুব পদ্ধতিমাফিক হয়নি। খুব সংক্ষেপে মন্তব্যধর্মী রচনাতেই তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of Bengali Language* (1926)-এর মতো বৃহৎ কোনো কাজ তাঁর নেই। মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (১৯৬৭) বা শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থের* (১৯৮৫) বহু লেখায় এ মতের পরিচয় আছে। এ বিবেচনা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করা আমাদের বর্তমান বিশ্লেষণের জন্য জরুরি নয়। বরং তিনি প্রণালি-পদ্ধতি মেনে লেখার চেয়ে ইনট্যুশন বা প্রজ্ঞার আলোকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন – এমন সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক। তাতে বোঝা যায়, তিনি বাংলা ভাষাচর্চার কোনো বিকল্প ধারা তৈরি করতে হয় চাননি বা পারেননি। কিন্তু বিদ্যমান ধারা বা প্রবণতার ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর রচনা ও মতামতে সেই দ্বিধারই প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কিত আলাপের আগে উপরে বর্ণিত দুটি এলাকায় শহীদুল্লাহ্‌র কাজের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

উনিশ শতকে বাংলা ব্যাকরণচর্চার মূল লক্ষণ ছিল সংস্কৃতের ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণকে যথাসম্ভব ঢেলে সাজানো। প্রকল্পটা শুরু হয়েছিল হ্যালহেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮) থেকে। উইলিয়াম কেরির ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮০৫) থেকে ছাঁচটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। পুরো প্রকল্পটির পেছনে মূল যে তত্ত্ব কাজ করে গেছে তা হল, বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা, ফলে সংস্কৃতের ঐশ্বর্য অকৃপণভাবে গ্রহণের অধিকার বাংলার আছে। শুধু অধিকার নয়; প্রয়োজনীয়ও বটে – যে মিশ্রণ আর 'অশুদ্ধি' বাংলা ভাষাকে দূষিত করেছে, কেবল সংস্কৃতের রীতি-পদ্ধতি মেনেই তার নিরাকরণ সম্ভব : তত্ত্বীয়ভাবে না হলেও বাস্তবত বাংলা ব্যাকরণ আজতক এই মূলনীতিই মেনে চলছে। মাঝে শ্যামাচরণ

গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বাংলা ব্যাকরণের স্বপ্ন ও বাস্তবতা তৈরি করেছিলেন। সে আন্দোলনের প্রভাবেই সম্ভবত সুনীতিকুমারের মহাগ্রন্থ *The Origin and Development of Bengali Language* (1926) উৎস ও বিকাশের বর্ণনাকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে 'বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা-বর্ণনার' এক আকর গ্রন্থ (দেবেশ ২০০৩)। কিন্তু তিরিশের দশকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলা ব্যাকরণ আবার ফিরে যায় তার আগের ধারায়। অপেক্ষাকৃত নিপুণ ভঙ্গিতে অনুসরণ করতে থাকে সংস্কৃতের বর্ণনারীতি (মোহাম্মদ আজম ২০১৪)। ওই সুনীতিকুমারেরই ১৯৩৯ সালের ব্যাকরণ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ভাষা-প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ কাজ করেছে প্রধানত বাংলার 'তৎসম' উপাদান নিয়ে; অধ্যায়গুলোতে পরিশিষ্টের মতো করে 'বাংলা' উপাদানের আলোচনা যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ধ্বনি, সন্ধি, প্রত্যয় ইত্যাদির আলোচনা পাঠ করা যায়। দেখা যাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃত উপাদান ও নিয়মকে মূল ধরে বাংলা উপাদানগুলোকে দেখানো হয়েছে বিচ্যুতি হিসাবে। তাই বাংলায় কখনো ব্যবহৃত হয়নি, এমন বর্ণ বা ধ্বনির আলোচনা তাতে পাওয়া যায়। সন্ধি-অংশে পাওয়া যায় এমন বহু শব্দ যেগুলো কোনো অর্থেই বাংলা শব্দ নয়। প্রত্যয় হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে খাঁটি সংস্কৃত রূপ, যার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণভঙ্গি ও শব্দরূপনির্মিতির কোনো সম্পর্ক কখনোই ছিল না। খানিকটা দ্বিধা সত্ত্বেও কারকের তালিকায় 'সম্প্রদান' থেকে যায়, যা বাংলা ভাষার অনেক পুরোনো ব্যাকরণে বাদ পড়েছিল (প্রবাল ১৩৯৪ : ২৩৭)। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক আরো অনেকের আলোচনা সুনীতিকুমার আমলে আনেননি। রবীন্দ্রনাথ ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, ইঙ্গিতমূলক শব্দ, বহুবচন ও লিঙ্গের চিহ্ন সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করেছিলেন, তার প্রায় কিছুই এ ব্যাকরণে গৃহীত হয়নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে অধ্যায়-বিভাজনের যে রীতি বাংলা ব্যাকরণে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সুনীতিকুমার প্রায় হুবহু তার অনুসরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, 'এই ব্যাকরণে সাধু ভাষার সহিত চলিত ভাষাও স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধুর আসনই মুখ্য। ব্যাকরণটি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে তাহার রূপও সাধু। বস্তুত তাঁহার নিজের পক্ষপাত সাধুর দিকেই' (বিজন ১৯৭৭ : ১৭১)। অথচ আগের বছর, ১৯৩৮ সালেই বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *বাংলাভাষা-পরিচয়*, যা চলিতরীতির ভিত্তিতে রচিত। তাই 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ', শৃঙ্খলা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ ব্যাকরণ বাংলা ভাষাচর্চায় কোনো নতুন পথ তৈরি করেনি। আদতে এ ব্যাকরণ সংস্কৃতরীতিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখার দীর্ঘ প্রক্রিয়াকে চরম প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল; কারণ, 'বাজারের ব্যাকরণগুলিতে স্বভাবতই সুনীতিবাবুর অনুসরণ দেখা যায়' (বিজন ১৯৭৭ : ১৭১)।

'নবব্যাকরণবিদ'রা বাংলা ব্যাকরণের যে ধরন প্রস্তাব করেছিলেন, সুনীতিকুমার যে মোটেই তার অনুসরণ করেননি, তার সাক্ষ্য দিয়েছেন আরেক ভাষাতাত্ত্বিক-বৈয়াকরণ সুকুমার সেন। তিনি লিখেছেন: 'শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের যে দোষ দেখিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো বিদ্বান মনীষী সংশোধনের অথবা প্রতিকারের জন্য কলম ধরেন নি। এমন-কি সুনীতিবাবুও তা এড়িয়ে গেছেন তাঁর বিরাট 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ' (হরপ্রসাদ ২০০০ : ৬০৩)। উদাহরণ এবং কারণও জানিয়েছেন সুকুমার সেন:

> বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপে সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের জোট মেলাবার চেষ্টা করে লেখকেরা যে বিভক্তি-কারক-case-এর ঘণ্টি পাক করে গেছেন তা এখনো বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। এই দোষের ভাগী আমিও, সুনীতিবাবুর মতো। সুনীতিবাবুর সঙ্গে মিলে আমিও একদা স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলুম। অপরাধ যেমন স্বীকার করছি, তেমনি এ কথাও জোর করে বলছি যে বাংলা ব্যাকরণ আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে রচনা ও প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। সেই বই শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কখনোই পঠন-পাঠনযোগ্য বলে সমর্থন করতেন না। (হরপ্রসাদ ২০০০ : ৬০৩)

সুকুমার সেনের এ বয়ান সংস্কৃতপন্থীদের সংখ্যাধিক্য এবং শক্ত ভিত্তির কথা বলে। সুনীতিকুমার এবং তিনি নিজেও আসলে সেই প্রতাপশালী কাঠামোকে সমর্থন জুগিয়েছেন। তার প্রমাণ এই যে, তাঁরা স্বাধীনভাবে 'অন্যরকম' কোনো ব্যাকরণ রচনা করেননি। সুনীতি-সুকুমারের ব্যাকরণ বাংলাভাষীরা গ্রহণ করত না—সাধারণভাবে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কালের সংস্কৃতপন্থীদের সঙ্গে পরবর্তীকালের সংস্কৃতপন্থীদের একটা পার্থক্য সহজেই নজর কাড়ে। সেকালের সংস্কৃতপন্থীরা ছিলেন শুধুই সংস্কৃতের পণ্ডিত—বাংলাবিদ্যা বা অপরাপর বিদ্যায় তাঁদের সাধারণ স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালের সংস্কৃত-সমর্থক অনেকেই বাংলা ভাষা ও ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত। তাই তাঁদের মত সহজেই গ্রাহ্য হয়েছে। উপরে ভাষাতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে, তার বাইরে এ বাস্তবতার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের সংস্কৃতায়নের বিরোধিতাকারীদের—যাঁদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের সুনীতিকুমারও পড়বেন—একজনও সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনো বিরূপতা দেখাননি। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ভাষাতত্ত্বসম্মত। তবু বিপরীত ধারারই প্রতিষ্ঠা ঘটল। সে প্রতিষ্ঠা কত প্রবল আর কার্যকর, তা বোঝার জন্য অনেক পরে প্রকাশিত আরেকটি ব্যাকরণগ্রন্থের পর্যালোচনা করা যাক।

জ্যোতিভূষণ চাকীর *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। সরস কথ্যভঙ্গিতে রচিত ব্যাকরণটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু এর যে কোনো অংশ

পড়লেই বোঝা যায়, এটি বর্ণনামূলক নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আনুশাসনিক। সে অনুশাসন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রচলিত বিভাজন তিনি মেনে নিয়েছেন; তবে তাতে সংস্কৃত শব্দের পরিসর আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তৎসম শব্দের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "সংস্কৃতের মতো' বলতে বুঝতে হবে উচ্চারণে তফাত হলেও আকৃতিতে অর্থাৎ বানানে যা অপরিবর্তিত থাকছে তা' (জ্যোতি ২০০১ : ২৭)। এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিচয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অন্য অনেকের উত্থাপিত মূল প্রশ্ন—বাংলায় আগত সংস্কৃত শব্দগুলো আসলে কেবল দেখায় অর্থাৎ বানানে তৎসম, বলায় বা উচ্চারণে নয়—তিনি এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে পুরো বইতে ব্যবহার করেছেন বিপুল সংস্কৃত শব্দ, যেগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। 'প্রতিশব্দ' অনুচ্ছেদে (জ্যোতি ২০০১ : ২৮) অগ্নি ও অগ্নিবাচক শব্দের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে তনূনপাৎ, চিত্রভানু, বিভাবসু, কৃপীটযোনি, বায়ুসখ, হুতভুক্, হুতাশন, হব্যবাহন, বীতিহোত্র, বহ্নি, পাবক ইত্যাদি। বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা, তাঁর মতে, ১৪টি। 'ধ্বনি বর্ণ উচ্চারণ' শিরোনামের অধ্যায়টিতে বাংলা ভাষার এ বৈয়াকরণ সংস্কৃত উচ্চারণকে নির্দেশ করেছেন মূল-উচ্চারণ হিসাবে; আর বাংলা উচ্চারণ দিয়েছেন তার বিকৃতি হিসাবে। ষত্ব ও ণত্ব বিধান, সন্ধি, প্রত্যয় ও উপসর্গসহ প্রায় সকল অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে এমন নিয়ম, যার অনুকূলে বাংলা ভাষা থেকে কোনো উদাহরণই দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে প্রত্যয়ের আলোচনা সবচেয়ে সুলিখিত; কারণ এ অধ্যায়ের সূত্রগুলো প্রত্যয়ের রূপসহ হুবহু সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে। অব্যয় কিংবা উপসর্গের মতো অধ্যায়ের আলোচনায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভালো ধরা পড়ে। এই পরিভাষাগুলো বাংলায় হুবহু সংস্কৃতের মতো নয়। জ্যোতিভূষণ এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত সংজ্ঞা-অনুযায়ী আলোচনা করে পরে বাংলার ব্যতিক্রম নির্দেশ করেছেন। গ্রন্থটির একটি পৃথক অংশে পশ্চিমা ব্যাকরণচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল আলোচনায় তার কোনো ব্যবহার নেই। তা সম্ভবও ছিল না, হয়ত দরকারও ছিল না। লেখক নতুন ভাষায় পুরোনো ব্যাকরণই লিখতে চেয়েছেন। ভূমিকায় অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন: 'নতুন করে ব্যাকরণটি লিখতে চেষ্টা করেছি বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেনকে সর্বদা মনের মধ্যে রেখে'। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* কার্যত *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণের* একটি আধুনিক সংস্করণ হয়েছে; সুকুমার সেনের ছায়াও হয়ত এতে পাওয়া যাবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রস্তাব পরোক্ষভাবেও এতে অনুসৃত হয়নি। এ ব্যাকরণও 'প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ হয়ে উঠতে পারেনি' (পবিত্র ২০০৩ : ১৪৬)।

এই মানচিত্র মনে রাখলে শহীদুল্লাহ্‌র ব্যাকরণ-প্রকল্পের তাৎপর্য বোঝা যাবে। তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের প্রস্তাব। প্রস্তাবের বাস্তবায়নে তিনি সফল হননি। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮) মূলত তাঁর এই ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট মনে রাখলে

বোঝা যায়, তাঁর এই ব্যর্থ প্রকল্প আসলে প্রচলিত ব্যাকরণধারায় তাঁর অস্বস্তিরই প্রকাশ। নতুনত্বটা এসেছে এই অস্বস্তি থেকে। পরবর্তীকালে যাঁরা নতুন ব্যাকরণ রচনা করতে চেয়েছেন তাঁদের কাছে শহীদুল্লাহ্‌র উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণই মনে হয়েছে (রফিকুল ও পবিত্র ২০১১)।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার উৎপত্তি-সম্পর্কিত শহীদুল্লাহ্‌র মত পঠিত হওয়া দরকার। তাঁর মতের পক্ষে তিনি যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেননি; তাঁর মত উত্তরকালীন বিশ্লেষকরা খুব গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনাও করেননি (মনসুর ১৯৮৫)। স্পষ্টই বোঝা যায়, শহীদুল্লাহ্‌র কাছে প্রকল্পটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ প্রচলিত প্রকল্পে তিনি স্বস্তিবোধ করছিলেন না। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান একটি প্রকল্পনির্ভর বিজ্ঞান, যেখানে খুব সহজেই আর্যভাষার নামে পশ্চিম ইউরোপ আর ভারতকে মিলিয়ে দেয়া যায়, মাগধী প্রাকৃতের বিশাল ভূগোলের সাথে বাংলাকে সম্পর্কিত করে বাংলাকে খাঁটি 'আর্যভাষা' করে তোলা যায়, আর 'হস্ত–হথ–হাত'-এর মতো শিশুতোষ সব ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করে বাংলাকে ভালোভাবেই সম্পৃক্ত করা যায় পশ্চিম ভারতের সঙ্গে। শহীদুল্লাহ্‌ এই প্রকল্পনির্ভর বিজ্ঞানকে প্রশ্ন করেননি, কারণ তাঁর নিজেরও সম্বল সেই বিজ্ঞানই। সেই সম্বলে ভর করে নিজস্ব প্রকল্পে তিনি কথামালা ও যুক্তি সাজিয়েছেন।

শুরুতেই যে বলেছিলাম, ভাষা এবং ভাষাচর্চা এক বস্তু নয়, সে কথা মনে রাখলে ভাষা-বহির্ভূত নানা উপাদান কিভাবে ভাষা-বিশ্লেষণকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা সম্ভব হবে। প্রবাল দাশগুপ্তের মনে হয়েছে (১৯৮৭ : ৫), 'অবভিয়াস ভৌগোলিক কারণে বাংলা ভাষাটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষা আর হিন্দীর মাঝামাঝি'। এই সরল কথাটা আরো অনেকের কেন আরো আগে থেকে মনে হয়নি, কে জানে? সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খেয়াল করেছেন, বাংলা ভাষা-বিশ্লেষকরা বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি জবরদস্তিপূর্ণভাবেই মিলিয়ে দেন সংস্কৃতের সাথে, অ-সংস্কৃত উৎসে তালাশ করার চেষ্টা করেন না (সুনীতি ১৯৮৯: ৯৫-৯৬)। একই ধরনের অভিযোগ সুকুমার সেন সম্পর্কে তুলেছেন পবিত্র সরকার (পবিত্র ১৯৯৯ : ১৪৮)। বলতেই হবে, বাংলা ভাষার সাথে অনার্য ভাষার গভীর সাদৃশ্যের দিকে শহীদুল্লাহ্‌র চোখ পড়েছিল অন্য অনেকের আগেই। ''বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব'-এর আলোচনাটি নব্যভারতীয় আর্যভাষাতত্ত্বে তাঁর অন্যতম মৌলিক অবদান' (পবিত্র ১৯৮৫ : ১১৫)। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি এই সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সন্দেহ নাই, তাঁর ভাষা-প্রকল্পই তাঁকে এদিকে নজর ফেরাতে উৎসাহিত করেছিল।

৫

ভাষাতাত্ত্বিক শহীদুল্লাহ্‌র মূল্যায়ন এ রচনার লক্ষ্য নয়। আমরা আলাপ করতে চেয়েছি তাঁর প্রকল্পের স্বাতন্ত্র্য ও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গত দুই শতাব্দীর চর্চায় বাংলা ভাষা-বিশ্লেষণের যে ধারা গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেই শহীদুল্লাহ্‌

কাজ করেছেন। কিন্তু 'মূলধারা'র বেশ কিছু অনুমান আর কর্মপ্রণালি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অস্বস্তি ছিল। তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতির দিক থেকে তিনি এর বাইরে যেতে পারছেন না, আবার অনুমানগুলো মেনে নিয়ে স্বস্তিও পাচ্ছেন না। এ অবস্থাকে বলতে পারি তাঁর 'অসুখী চৈতন্য' – unhappy consciousness। এই অসুখী চৈতন্যই তাঁকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছে তাঁর স্বতন্ত্র প্রকল্পগুলো। একেই আমরা বলেছি তাঁর 'অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা'। প্রশ্ন হল, এই অসুখী চৈতন্যের উৎস কী? নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু অনুমান করা যেতে পারে।

শহীদুল্লাহ্ সাহেবের একজন জীবনীকার হায়াৎ মামুদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এ কথাগুলো উদ্ধৃত করেছেন (হায়াৎ ১৯৮৫ : ২৪) : 'শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রধান কৃতিত্ব বাঙালির ভাষার ও সংস্কৃতির সার্থক আলোচনা, এবং আনুষঙ্গিকভাবে মুসলমান বাঙালির আহৃত উপাদান নির্ণয় করা।' এরপর হায়াৎ মামুদ লিখেছেন: 'যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে যোগ্য ব্যক্তির যুক্তিনিষ্ঠ নিরাবেগ মূল্যায়ন, সন্দেহ নেই'।

একটু সতর্ক হয়ে পাঠ করলেই বোঝা যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত আর হায়াৎ মামুদের সমর্থন দুটোই ভয়াবহ। এখানে 'মুসলমান বাঙালির আহৃত উপাদান'কে 'বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি' থেকে আলাদা করা হয়েছে। অধিক মন্তব্য অপ্রয়োজনীয়। আমাদের জন্য এখানে কেবল এ কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, সুনীতিকুমারের মত অনুসারে শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষাচর্চার মূলধারায় কাজ করেছেন; কিন্তু তাঁর 'আনুষঙ্গিক' আরো কাজ ছিল। সেই আনুষঙ্গিক কাজই কি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁকে দিয়ে 'অন্তর্ঘাতমূলক' কাজ করিয়ে নিয়েছে?

রচনাপঞ্জি

জ্যোতিভূষণ চাকী (২০০১)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, ২য় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

দেবেশ রায় (২০০৩)। *অপর ভাষা*, অক্ষর পাবলিকেন্স, আগরতলা, ত্রিপুরা

নির্মল দাশ (২০০০)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ*, ২য় সংস্করণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

পবিত্র সরকার (১৯৮৫)। 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

পবিত্র সরকার (১৯৯৯)। *ভাষামনন : বাঙালি মনীষা*, ২য় সংস্করণ, পুনশ্চ, কলকাতা

পবিত্র সরকার (২০০৩)। *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৮৭), *কথার ক্রিয়াকর্ম*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

প্রবাল দাশগুপ্ত (১৩৯৪)। 'লোহারাম শিরোরত্নের 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ'', *জিজ্ঞাসা*, শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যা, কলকাতা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৭৭)। *বাগর্থ*, ৩য় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা

মনসুর মুসা (১৯৮৫)। 'ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৭) 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-গ্রন্থ*, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯৬৭) 'মহামনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-গ্রন্থ*, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৯)। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৫)। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (২০১১) (সম্পাদিত)। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২)। *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা

রশীদ হায়দার (১৯৬৭)। 'সাত-পুরুষের শিক্ষক', *শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা-গ্রন্থ*, মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্ সম্পাদিত, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা

সরস্বতী মিশ্র (২০০০)। *বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৮৫)। 'শব্দশাস্ত্রবিদ্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯)। *বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে*, ২য় প্রকাশ, জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, কলকাতা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (২০০০)। *রচনা-সংগ্রহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

হায়াৎ মামুদ (১৯৮৫)। 'শহীদুল্লাহ্ : তাঁর জীবন, সুকৃতি ও সময়', *ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্মারকগ্রন্থ*, শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০০২) (সম্পাদিত)। *বাঙলা ভাষা*, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ : ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৮)। *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

Bakhtin. M. M. (1994). *The Dialogic Imagination. Four Essays*. Ninth paperback print. University of Texas press. Austin

Chatterji. Suniti Kumar (2002). *The Origin and Development of the Bengali Language*. 3rd impression. Rupa & Co. New Delhi

Ganguli. Syamacharan (1990). Bengali Spoken and Written. reprint. *Akademi Potrika* 3. Poshcimbongo Bangla Akademi. Calcutta

Philipson. Robert (2003). *Linguistic Imperialism*. 6th impression. Oxford University Press